শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

রাশেদ রউফ

তাম্রলিপি

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প
রাশেদ রউফ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৯১

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস
১৮/২৩ গোপাল শাহ লেন, ঢাকা

মূল্য : ৩৪০.০০

Srestho Kishoregolpo
By : Rashed Rouf
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 340.00 $12

ISBN : 978-984-98741-1-9

উৎসর্গ

অধ্যক্ষ মো. মাজহারুল হক
শিক্ষার্থীদের সাহিত্যমুখী করতে
যাঁর ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য

কথা সামান্যই

পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন : 'নিজের কবিতা নিজে বাছাই করার মস্ত ঝুঁকি। তার ওপর নিজের সমগ্র কবিতা থেকে কেবল শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোকে খুঁটে নেওয়া, সে তো আরো দুরূহ দায়। এ যেন কোনো জননীর কাছে জিজ্ঞাসার মতো, আপনার সন্তানদের মধ্যে কে বেশি প্রিয়? যে ছেলেটি কানা কিংবা খোঁড়া, তার সম্পর্কে মায়ের মমতা নাকি গভীর। কবিদের ক্ষেত্রেও এটা কম সত্যি নয়। হয়তো বক্তব্যে অগভীর কিন্তু ছন্দের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এমন একটা কবিতা সম্পর্কে একজন কবি স্বভাবতই হবেন মমতাময়।'

আমার 'শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর কথাগুলো মনে পড়ে গেল। শিশু-কিশোরদের জন্য এ যাবত যত রচনা লেখার প্রয়াস পেয়েছি, আমার নিজের কাছে সবগুলো রচনাই প্রিয়। কোনোটাকে ছোটো করে কোনোটাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করতে চাই না। তবু এর আগে প্রকাশিত হয়েছে আমার 'শ্রেষ্ঠ কিশোর কবিতা'। এবার প্রকাশিত হলো 'শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প'। গ্রন্থে অনেকগুলো গল্প স্থান পেয়েছে, সবগুলো গল্প আমার ভালো লাগার। আশা করি, পাঠকেরও ভালো লাগবে।

গ্রন্থটি প্রকাশ করে তাম্রলিপি আমাকে প্রীত করেছে। প্রকাশক এ. কে. এম. তারিকুল ইসলাম রনিসহ প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে মঈন ভাই অনেক শ্রম দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

রাশেদ রউফ

সূচিপত্র

পরিগুলো এত ভালো কেন	১১	ছন্দে–আনন্দে	৯৬
দুষ্টু পাখি মিষ্টি পাখি	১৪	বাবার চোখে বড় স্বপ্ন	৯৮
আহা মেলা!	১৭	হিমাংশু কাকু : জীবনের পাঠদান	১০০
আমাদের পরিবন্ধু	২১	গ্রামে বিদ্যুতের প্রথম হাতছানি	১০৩
আরো দিন আছে	২৪	ক্লাস ছেড়ে পুকুর পাড়ে	১০৬
বইগুলো নিয়ে গেলে পড়ব কী করে!	২৭	বন্ধু চিরকাল	১০৯
বাবারা কি মায়ের মতো হয়	৩০	মুজিব বাইয়া যাও রে	১১১
ফ্ল্যাটবন্দি	৩৩	জয় বাংলা : ইসমে আজম	১১৩
পরিবন্ধু	৩৬	বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে কষ্ট	১১৫
বারে বারে আসে পরি	৩৮	সচেতন হয়ে উঠছে গ্রামের মানুষ	১১৭
শিরীষ তলার ছায়া	৪১	পাকিস্তানি চানতারাতে আগুন জ্বলে ওঠে	১১৯
শহিদ মিনারে	৪৫	সহপাঠী যখন অগ্রজ	১২১
কী আনন্দ!	৪৭	নাগরদোলায় দোল খায় আনন্দ	১২৩
একদিন সকালে	৫০	বাংলার বুকের ওপর ভারী পাথর	১২৬
পরি কি সত্যি সত্যি ঘরে এসেছিল	৫৩	ঢেউয়ের সঙ্গে মিতালী	১২৮
পরির সাথে আনন্দমেলায়	৫৬	রক্তের ভিতর বয়ে যায় বিদ্যুৎ	১৩০
একুশে ফেব্রুয়ারি	৫৯	তোমাকে প্রণাম মা	১৩২
ঈদের ছুটি	৬২	বিল পেরিয়ে ডোবা মাড়িয়ে	১৩৪
আয়মান ও মাছের গল্প	৬৫	আশায় জাগে বুক	১৩৬
আমাদের ইশকুলে পরীক্ষা নেই	৬৭	চানতারায় থুত	১৩৮
রূপ-অরূপের আলো	৭০	জেগে ওঠে পাড়া	১৪০
আলাদীনের চেরাগ নয়–আবিরের আংটি	৭৪	জ্বলছে বাড়ি	১৪২
লোকটা ভূত নয়তো?	৭৭	ভয়ে আতঙ্কে	১৪৪
কাকবন্ধু	৮১	নির্ঘুম রাত অনাহারী দিন	১৪৬
চড়ুই পাখির জন্য ভালোবাসা	৮৫	দেয়াঙ পাহাড়ে যুদ্ধ	১৪৮
ভূতের সঙ্গে রাত্রিদিন	৮৮	বিজয় নিশান উড়ছে অই	১৫০
লবণের নদী চানখালী	৯১	বন্ধু হারানো দিন	১৫২
বীরের স্বপ্ন	৯৪	খোকা	১৫৬

পরিগুলো এত ভালো কেন

সূর্য আজ সত্যি সত্যি পশ্চিমে উঠেছে। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও বাবা আজ আয়মানকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন আনন্দভুবনে। শিশুপার্কেই নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাবা ভাবলেন আয়মানের জন্মের পর গত তিন বছরই যখন তাকে নিয়ে কোনো স্থানে বেড়ানো হয়নি, তখন আজ একটু ব্যতিক্রমী জায়গায় গেলে কেমন হয়। যেমন ভাবা তেমন কাজ আয়মানের সাথে তার ভাইয়া আবিরও আছে।

প্রবেশ গেট। ঢোকার জন্য অনেক মানুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে। বাবাও দাঁড়ালেন লাইনে। সঙ্গে আয়মান ও আবির। ভেতরে ঢুকেই বাবা দেখেন একটা অন্য রকম ভুবন। আছে সাজানো বাগান, ছোটদের খেলনার সরঞ্জাম, আছে রেলগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, হাতিও আছে একপাশে। বাহ্ খুব সুন্দর। ওরা হাঁটছে হাত ধরাধরি করে। বাবা শুরুতেই সাবধান করে দিয়েছেন, যেন কেউ কারো হাত না ছাড়ে। এটা ওটা দেখে সামনে এগোতেই বাবার চোখে পড়ে একটা ঝলমলে ঘর। ঘরের নাম 'পরির ভুবন'। সাইনবোর্ডে তিনটি পরির ছবিও আঁকা আছে। একটা লাল, একটা নীল, একটা সাদা। বাহ্ চমৎকার তো! ঘরের কাছে গিয়ে জানতে পারেন নীতিমালা। যে কেউ পরির ভুবনে ঢুকতে পারবে না, যাদের বয়স পাঁচ বছরের নিচে– কেবল তারাই ঢুকতে পারবে। আবার সেখানে ঢুকতেও আলাদা টিকেট লাগবে। একজনের জন্য পঞ্চাশ টাকা। টাকার পরিমাণ একটু বেশিই বটে, তবু বাবা আয়মানকে সেখানে ঢোকাতে চান আজ। আবির বড় হয়ে গেছে– ক্লাস সেভেনে পড়ে। তাই সে ঢুকতে পারবে না। বাবা আয়মানের জন্যই টিকেট কাটেন। টিকেট নিয়ে 'পরির ভুবনের' দরজার সামনে দাঁড়ানো মাত্রই খুলে গেল দরজা এবং অপূর্ব সুন্দর এক মেয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালো এদের। বাবাকে মেয়েটি বলল, আপনারা এক ঘণ্টা বাইরে অন্য দৃশ্য উপভোগ করুন। আমি আয়মানকে নিয়ে যাচ্ছি। এক ঘণ্টা পর এখানে দাঁড়ালে আয়মান আপনাদের কাছে চলে আসবে। কী আশ্চর্য!

মেয়েটি আয়মানের নাম জানলো কী করে! আয়মানও ঠিক মেয়েটির হাত ধরে কী সুন্দর চলে গেল! অবাক হয়ে গেল আবির, অবাক হলেন বাবাও। পরির ভুবনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভাবনায় পড়লেন বাবা। বাইরে ঘোরাঘুরি দূরে থাক, আয়মানের চিন্তায় ওখানেই বেঞ্চিতে বসে পড়লেন তিনি। নানা ধরনের দুশ্চিন্তা মাথায় খেলছে। একি করলেন তিনি! এটা কেমন পরির ভুবন– যেটা আলাদা করে দেয় মেয়েকে, বাবাকে। দরকার হলে টিকেটের মূল্য আরো বেশি নিতো, কিন্তু সঙ্গে কাউকে ঢুকতে দেবে না কেন! আয়মান মা আয়মান! সে ভেতরে কী করছে? মনে হচ্ছে সব জাদুর খেল। কী জন্য পরির ভুবনে ঢোকাতে টিকেট কাটলেন– তার জন্য আফসোস করছেন মনে মনে। বাবার এসব দুর্ভাবনার কথা না জানলেও আবির বুঝতে পেরেছে– বাবার চেহারা হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ কী! শেষে নির্ভয় দিলো আবিরই।

– বাবা, তুমি অতো কিছু ভেবো না। ওরা নিশ্চয় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে। আর, আয়মান হয়তো এখন খেলা করছে পরির সাথে সাথে।

বাবাকে কথাটি বলার পর ভেতরে ভেতরে তার নিজের জন্যও দুঃখ লাগল। কেন সে পাঁচ বছরের চেয়ে বেশি– যার কারণে আয়মানের সাথে ঢুকতে পারলো না পরির ভুবনে। আয়মান নিশ্চয় অনেক মজা করছে!

পরির ভুবন এক মহা আনন্দভুবন। সেখানে সব রঙিন পরি। লাল পরি, নীল পরি, সাদা পরি, হলুদ পরি, সবুজ পরি– নানা রঙের পরি। পরিরা শিশুদের নিয়ে খেলে। ওদের ডানায় চড়ে শিশুরা বেড়ায়। ওরা আকাশে ওড়ে। আকাশের তারা ধরে। নানা রঙের পরি মিলে একেকটা শিশুকে মাতিয়ে রাখে। দোলনা নয় পরির ডানাই ওদের দোলনা। দোল খায় শিশুরা। মজা পায়। ওরা ভুলে যায় তাদের নিজস্ব জগৎ। মা- বাবা-ভাই-বোন কারো কথা মনে নেই আয়মানের। খাওয়ার কথা ভুলে গেল। সে কেবল হাওয়ায় উড়ছে পরিদের সাথে। সব পরি তার পছন্দ। তবে সাদা পরি তার বেশি পছন্দ। মা মাঝে মধ্যে তাকে সাদা পরির মতো সাজায়। সাদা পরিকে আয়মান বলল : আচ্ছা, তুমি তো ভালো পরি। বলার সাথে সাথে নিজে লজ্জাও পেলো–। অন্য পরিগুলোও তো ভালো। এখানে সব পরি ভালো। সব বাবু ভালো। বাবুরা খেলছে বেলুন নিয়ে। কেউ কাঁদে না। কেউ ঝগড়া করে না। কী সুন্দর সবাই। পরিদের ভিড়ে আয়মান নিজেও যখন পরি ভাবতে শুরু করে, ঠিক তখন পূর্ণ হয় এক ঘণ্টা। চোখের পলকে আয়মানকে নিয়ে

যাওয়া হলো পরির ভুবনের দরজায়, যেখানে অপেক্ষা করছে তার বাবা ও ভাইয়া। যেই মেয়েটি আয়মানকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই মেয়েটিই ফিরিয়ে দিলো তাকে। কী অদ্ভুত!

আয়মানকে পেয়ে বাবার যে কী আনন্দ, তা' ভাষায় বর্ণনা করা মুশকিল। কিন্তু আয়মান! সে মহা বিরক্ত। কেন তাকে পরির দোলনা থেকে নিয়ে আসা হলো!

পরির ভুবন ছেড়ে, আনন্দভুবনের গেট পেরিয়ে ওরা যখন বাসায় ফিরছে, তখন সন্ধ্যা নেমেছে পথে। রিকশা করে বাড়ি ফিরছে ওরা। আয়মান বসেছে বাবার কোলে। সে বারবার আকাশের দিকে তাকায়। আকাশের তারার দিকে তাকায়। তারাগুলো যেন তাকে হাতছানি দিচ্ছে। হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক পরি। এবং মুহূর্তেই মিশে গেল হাওয়ার সাথে। শুধু কানে ভেসে এলো কয়েকটি মধুর শব্দ : 'আমরা তোমার সঙ্গে আছি। ভালো থেকো'।

দুষ্টু পাখি মিষ্টি পাখি

ওরা তিন বন্ধু।

তিন সাথি।

সবাই ওদের সবুজ সাথি বলে ডাকে।

একসাথে চলে। একসাথে খেলে।

গ্রামের সবাই তাদের কথা জানে।

একজনের নাম শফি, পুরো নাম শফিউল আলম। আরেকজনের নাম রণজিৎ জলদাস। তৃতীয় জনের নাম সুজিত ভট্টাচার্য।

শফি, রণজিৎ ও সুজিত ছোটোবেলা থেকে একই ইশকুলে লেখাপড়া করে। ছনহরা যতীশ প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করে ছনহরা ষোড়শী বালা উচ্চ বিদ্যালয়।

ওরা পড়ালেখা করে। ওরা বড় হয়। গ্রামের যে কোনো আয়োজনে তারা থাকে একেবারে সামনের সারিতে। বয়সে ছোট হলেও ওরা গ্রামের মানুষের কাজে লাগে।

ওদেরকে তাই সকলে আদর করে।

ভালোবাসে।

ইশকুলের শিক্ষকরাও তাদের পছন্দ করেন। পড়ালেখায় খুব একটা মেধাবী নয়। মাঝারি গোছের। তবু তারা সকলের প্রিয়।

ইশকুলের ক্লাসে কিংবা খেলার মাঠে সব জায়গায় তারা সপ্রাণ। তারা হাজির থাকা মানে সকলেই হাসি-খুশিতে থাকা। ইশকুল ছুটি হলে হাত ধরাধরি করে ওরা বাড়ি ফেরে। তিন পাড়ায় তিন জনের বাড়ি হলেও ওরা বেশিরভাগ সময়ই একসাথে থাকে।

এভাবে দিন যায়। সময় গড়িয়ে যায়। ওপরের ক্লাসে ওঠে। নবম শ্রেণি পেরিয়ে দশম শ্রেণি। তারপর এসএসসি পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হলেই ওরা খুশিতে আটখানা। কয়েক মাস না পড়লেও চলবে। কেবল খেলাধুলা। হাসি-আনন্দ। দিন কয়েক যেতে না যেতে তাদের খুশির নদীতে ভাটা নামে। তিন সাথির একজন চলে যাচ্ছে বিদেশে।

ভিসা চলে এলো শফির। কাতার চলে যাবে সে। সে ওখানে কাজ করবে। টাকা রোজগার করবে। তার বাবা তার জন্য ভিসা পাঠিয়ে দিলেন। বাবার কাছে নিয়ে যাবেন শফিকে। বাবা নাকি গত কয়েক বছর ধরে কাতারে থাকেন।

তড়িঘড়ি করে চলে যেতে হলো শফিকে। তাই শফিকে ছাড়া রণজিৎ ও সুজিতের দিন যেন চলে না। এ রকম দিন যেতে যেতে ওরা দুজনও যেন আগের মতো হাসে না, চলে না, খেলে না। একদিন দেখা গেল- ওরাও আলাদা হয়ে গেল। কারো কোনো খবর নেই। তিন সাথি তিন জায়গায়। শফি কাতারে। কিন্তু অন্য দুজন কে কোথায়ও ওরা নিজেরাও খবর রাখে না অপরের।

এভাবে আরো দিন যায়, বছর যায়। প্রায় ষোল বছর পর দেশে এলো শফি। দেশে ফিরেই তার দুই পুরনো সাথির কথা মনে করল। তার মনে পড়ে যায় পুরনো দিনের কথা।

মনে পড়ে।

মনও পোড়ে।

তাই বসে বসে ভাবতে লাগল কীভাবে ওদের দেখা পায়!

যেই ভাবা, সেই কাজ। পরদিন ভোরে দুই সাথির সাথে দেখা করতে বের হয় শফি। প্রথমে সে যায় জেলে পাড়ায়। রণজিৎ জলদাসের সাথে দেখা করতে।

এক বুক আশা আর আনন্দ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শফি। অনেক দিন পর আজ পুরনো সাথির দেখা পাবে। জেলেপাড়ায় ঢুকলো সে। রণজিতের বাড়ির কাছাকাছি যেতেই হঠাৎ 'ক্যাচ ক্যাচ' করে ওঠল এক পাখি। জোরে চিৎকার দিয়ে গালিগালাজ শুরু করল। শফি আশেপাশে তাকিয়ে দেখতে পেলো রণজিতের বাড়ির সামনে একটা গাছ। সেই গাছের ডালে বসে আছে সুন্দর একটা পাখি। দেখতে অপূর্ব। সেই পাখিই গালিগালাজ করছে খারাপ ভাষায়! অশ্রাব্য। কুশ্রাব্য।

: এই ব্যাটা, তুই কে? যাস কোথায়?

শফি শোনে তারপরের কথাগুলো। খুব খারাপ গালি।

তারপরও শফি বলে, রণজিৎ আমার পুরনো বন্ধু। তার সাথে দেখা করতে এলাম।

: সে নাই। খবরদার আর সামনে এগুবি না।

পাখির কথায় কষ্ট পায় শফি। ফিরে চলে। রণজিতের সাথে দেখা হলো না।

এবার ভাবে সুজিতের বাড়িতে যাবে কিনা। তার বাড়ি ব্রাহ্মণপাড়ায়। এক বুক আশা নিয়ে গিয়েছিল রণজিতের বাড়িতে। হতাশ হয়ে ফিরতে হলো। সুজিতের কাছে গিয়েও যদি হতাশ হতে হয়?

ভাবতে ভাবতে শফি হাঁটা শুরু করল। ব্রাহ্মণপাড়ায় সুজিতের বাড়ির দিকে। যেতে যেতে নানা কথা ভাবে। একেবারে সুজিতের বাড়ির কাছে গিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। চোখ পড়ল গাছের দিকে। দেখে গাছের ডালে বসে আছে সেই পাখিটি।

পাখিটিকে দেখে সে ভয়ে আঁতকে উঠল। আবার শুরু হবে গালিগালাজ? এবার আর সাহস পায় না পা বাড়াবার। থমকে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পরে সে ফিরে আসার জন্য মোড় নেবে, এমন সময় সুন্দর একটা ডাক ভেসে এলো :

: হে অতিথি! তুমি কার কাছে এসেছো? ফিরে যাচ্ছো কেন?

ঘাড় ঘুরিয়ে শফি দেখতে পায় ঐ পাখিটিই এ কথা বলছে। সে অবাক হয়। কিছুক্ষণ আগে যে খারাপ ভাষায় গালি দিলো, সে আবার কী চমৎকার করে ডাক দিলো: হে অতিথি!

শফি ভাবনার কূলকিনারা পায় না। পাখিটি আবার বলে : এসো, বাড়িতে এসো। বসো। কার কাছে এসেছো বলো।

পাখির কথায় আরো অবাক হয় শফি। তারপর বলে, কিছুক্ষণ আগে জেলেপাড়ায় তুমি আমাকে গালি দিয়েছো। আর এখন সুন্দর করে ডাক দিলে, সম্বোধন করলে। বলো তো কারণটা কী?

শফির কথায় হো হো করে হেসে উঠল পাখি।

বলল: যে পাখি তোমাকে গালি দিলো, সে আমি নই। সে আমার জমজ ভাই। আমরা দুই ভাই একই মায়ের ছেলে। দেখতে একই রকম। গলার স্বরও একই। কিন্তু ভাগ্যদোষে দুজন দু'পাড়ায় বড় হয়েছি। সে জেলেপাড়ায়। আমি ব্রাহ্মণপাড়ায়। সে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে লোকজনের চ্যাঁচামেচি শোনে, শোনে গালিগালাজ। আর আমি ঘুম থেকে উঠে সুর শুনি, শুনি সামগান। তাই হে অতিথি, তুমি মনে কষ্ট নিও না। আমার ভাইয়ের কোনো দোষ নেই। পরিবেশই আমাদের গড়ে তুলছে।

এত সুন্দর মিষ্টি পাখিটা! চমৎকার করে কথা বলে। তার কথা শুনে অভিভূত শফি। এখানে এসেও পুরনো বন্ধু সুজিতকে সে পায় নি। সেও জীবন জীবিকার টানে নাকি শহরে থাকে। তবু শফি এই দুই পাখির দেখা পেয়ে আনন্দিত। সে বুঝতে পারে– সুন্দর পরিবেশ কতোটা জরুরি।

(প্রচলিত গল্পের পুনকর্থন)